সেক্টরব্যাপী কর্মসূচিঃ সাফল্যের শর্তাবলী

আহসান মোহাম্মদ

উন্নয়নশীল অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে। প্রকল্পগুলো থাকে স্বল্প মেয়াদি, তাদের অধিকাংশই দুই-তিন বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এই স্বল্প সময়ের জন্য প্রকল্পের জনবল নিয়োগ করা হয়, অফিস নেয়া এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি ক্রয় করা হয়। প্রকল্পের অর্থ ব্যয় অপেক্ষাকৃত সহজ; সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার নিয়মনীতি প্রকল্পের জন্য শিথিল করে একটি ভিন্ন নীতিমালা করা হয়ে থাকে। ফলে এককালীন কিছূ অর্থ ব্যয় করে দ্রুত কোন কাজ যেমন রাস্তা, সেতু, ভবন ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, শিক্ষা ইত্যাদির মত সেবা খাতের অনেক কর্মকান্ডও প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছরের বাজেটে এক হাজারেরও বেশী প্রকল্প থেকে থাকে। প্রকল্পের সংখ্যা অত্যাধিক হয়ে যাবার কারণে তাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটিত নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো দেখা দেয়ঃ

ক. অনেক ক্ষেত্রে একই ভৌগলিক এলাকায় একই কাজ একাধিক প্রকল্প সম্পাদন করে থাকে। তাতে জনগণের অর্থের অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন আগে দেখা যেতো পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে অনেকগুলো প্রকল্প কাজ করতো, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন সমন্বয় ছিল না। ফলে হয়তো কোন কোন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা সেবা দিতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী অর্থ ও প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করা হতো, আবার কোন এলাকায় হয়তো প্রয়োজনীয় নূন্যতম সেবাটি পৌঁছত না। যেহেতু অনেকগুলো প্রকল্প আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করতো এবং তাদের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য তেমন কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না, তাই এই ধরণের সমন্বয়হীনতা কাটিয়ে ওঠা খুব কঠিন ছিল।

খ. সকল প্রকল্পেই ক্রয়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণের মত বিষয় থাকে যেগুলি ভালোভাবে সম্পাদন করতে বিশেষায়িত জ্ঞান প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত জ্ঞান সম্পন্ন জনবল ছোট প্রকল্পের জন্য ব্যবস্থা করা কঠিন। ৪-৫ জন কর্মকর্তা দিয়ে চালিত কোন একটি প্রকল্পের কেনাকাটার জন্য ক্রয় বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে গেলে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী হয়ে যেতে পারে।

গ. ঋণদাতা সংস্থাগুলো যখন বিভিন্ন প্রকল্পে বিচ্ছিন্নভাবে অর্থায়ন করে তখন তাদের মধ্যেও কোন সমন্বয় থাকে না। প্রকল্প ভেদে ঋণ ও অনুদানের অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের এতো ভিন্ন ভিন্ন রকম ব্যবস্থা থাকে যে তার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা ও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকল্প ব্যয়ের হিসাব রাখা অনেকটাই অসম্ভবই হয়ে পড়ে। কোন প্রকল্পে একটি ঋণদাতা সংস্থা হয়তো সরাসরি প্রকল্প পরিচালকের বাণিজ্যিক ব্যাংকের একাউন্টে টাকা দেয়। সরকার তার খবর রাখে না। উক্ত প্রকল্পেই আরেকজন ঋণদাতা হয়তো এমন ব্যবস্থা করলো যেখানে প্রথমে সরকার তার টাকা খরচ করবে, তারপর ব্যয়িত অর্থের একটি অংশ ঋণদাতা সংস্থা থেকে পুনর্ভরণের দাবী জানাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার ঋণদাতা সংস্থা অর্থ না দিয়ে সরাসরি পণ্য বা সেবা প্রদান করে থাকে। এ সব কারণে দেখা যায় দুই বছর মেয়াদি একটি প্রকল্পের অর্থায়ন প্রক্রিয়া বুঝতেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনেকটা সময় কেটে যায়। সরকারী খাতের আর্থিক অনিয়মের সিংহভাগ

ঘটে থাকে প্রকল্পে, যার জন্য প্রকল্পের অর্থ ছাড়, ব্যয় ও পুনর্ভরণ প্রক্রিয়ার জটিলতা এবং সে সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালনার সাথে জড়িতদের সম্যক ধারণার অভাব যথেষ্ট দায়ী।

এ সকল কারণে প্রকল্প ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিপরীতে সেক্টরব্যাপী কর্মসূচির ধারণার উৎপত্তি হয়। সেক্টরব্যাপী কর্মসূচিতে অনেকগুলো প্রকল্পকে একটি সেক্টর কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়। ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রথম সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (এইচপিএসপি) নামে। তাতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনের শতাধিক প্রকল্পকে একত্রিত করে একটি কর্মসূচির অধীনে নিয়ে আসা হয়। সম প্রকৃতির কর্মকাণ্ডকে একত্রিত করে এক একটি অপারেশনাল প্লান তৈরী করা হয় এবং সেগুলিকে বাস্তবায়নের জন্য একটি সংগঠনিক অঙ্গ তৈরী করে প্রয়োজনীয় জনবল দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ পরিবার পরিকল্পনা ও মাতৃসেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশকে একত্র করে ইএসপি (পরিবার পরিকল্পনা) নামে একটি অপারেশনাল প্লান তৈরী করা হয়েছিল। একইভাবে পুরো কর্মসূচির সকল কেনা কাটার জন্য তৈরী করা হয়েছিল আরেকটি অপারেশনাল প্লান। এভাবে সম প্রকৃতির সকল কর্মকাণ্ডকে একই কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসার ফলে আরো ভালোভাবে পরিকল্পনা করা যায় এবং অপচয় কমানো যায়। অপরদিকে সেক্টরব্যাপী কর্মসূচির অধীনে ঋণদাতা সংস্থাগুলো তাদের অর্থ একটি যৌথ তহবিলে জমা রাখে। একই তহবিল থেকে একই পদ্ধতিতে খরচ হওয়ার কারণে খরচের হিসাব রাখা, সে খরচ যে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার নিয়ম নীতি অনুসরণ করে হচ্ছে তা নিশ্চিত করা এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হয়ে যায়।

উপরের আলোচনায় মনে হতে পারে যে সেক্টরব্যাপী কর্মসূচিতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সকল সমস্যারই সমাধান নিহিত রয়েছে। তবে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পদের অধিকতর পরিকল্পিত ও কার্যকর ব্যবহারের ব্যবস্থা সেক্টর কর্মসূচিতে থাকলেও এর ঝুকিও রয়েছে। সেগুলোকে যথাযথভাবে বিবেচনা করে তা মোকাবেলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে বিপর্যয় ঘটতে পারে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (এইচপিএসপি) এভাবেই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। একটি সেক্টর কর্মসূচিকে সফল করতে যে সকল প্রধান ঝুঁকি বিবেচনা করে সেগুলোকে মোকাবেলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হচ্ছেঃ

১. একটি সেক্টরে এ ধরণের কর্মসুচি চালু করার প্রথম ধাপে ব্যাপক প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। সংস্কার সকল সময়েই ঝুঁকিপূর্ণ। যে প্রতিষ্ঠানে সংস্কার করা হয় তা যত বড় হয় এবং সংস্কারের গতি যত দ্রুত হয় ঝুঁকি ততো বেড়ে যায়। প্রকল্প ব্যবস্থা থেকে এ ধরণের সেক্টর কর্মসুচিতে পরিবর্তন একটি খুব বড় ধরণের সংস্কার। এটি অনেকটা লক্ষ লক্ষ এককোষী অ্যামিবাকে সংযুক্ত করে একটি মানুষ তৈরীর মত। একটি মাত্র কোষেই অ্যামিবার সকল কর্মকান্ড সম্পন্ন হয়। খাওয়া দাওয়া, বংশ বৃদ্ধি সবকিছু একটি মাত্র কোষই সংঘটিত হয়। প্রকল্পগুলোও তেমনি। অতি ক্ষুদ্র প্রকল্প হলেও সে তার কেনা-কাটা, প্রশিক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্পের মূল কাজ - সব কিছু নিজেই করে থাকে। সবকিছু একা করতে গিয়ে সে হয়তো সঠিক ভাবে ও পূর্ণ দক্ষতার সাথে কাজগুলো করতে পারে না, কিন্তু প্রয়োজনের কাজটি চালিয়ে নিতে পারে। অপরদিকে লক্ষ লক্ষ কোষ নিয়ে যখন মানব দেহের মত অতি বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী একটি প্রাণী তৈরী হয় তখন এককোষী অ্যামিবার থেকে তার শক্তি, ক্ষমতা ও বৃদ্ধিমত্তা বেড়ে যায় বহুগুন। কিন্তু পাশাপাশি বেড়ে যায় তার জটিলতা এবং সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা। বুদ্ধিমান প্রাণীটির এক টুকরা খাবার মুখে দিতেও প্রয়োজন হয় বিভিন্ন অঙ্গের লক্ষ লক্ষ কোষের মধ্যে সুক্ষ ও জটিল সমন্বয়। যেমন ক্ষুধা পেলে পাকস্থলী মস্তিস্ককে জানায় তার

খাবার প্রয়োজন; মস্তিস্ক চোখ, হাত, নাক ও কানকে বলবে খাবার খুঁজতে। খাবার পাওয়া গেলে যথাযথ অঙ্গের মাধ্যমে তাকে মুখের কাছে নিতে হবে। তখন মুখকে খাবার গ্রহণ করতে হবে, দাঁতকে চিবাতে হবে এবং বিভিন্ন গ্রন্থিকে জারক নিঃসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সমন্বয়ের একটু অভাব হলে, কিংবা কোন অঙ্গ প্রয়োজনের সময় কাজ করতে ব্যর্থ হলেই বিপত্তি ঘটবে এবং কাজটি সম্পন্ন হবে না। সেক্টরব্যাপী কর্মসূচির ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে থাকে। প্রকল্প ব্যবস্থায় শতাধিক প্রকল্প তাদের নিজেদের কেনাকাটা নিজেরাই করতো। কর্মসূচির অধীনে তাদের সকল কেনাকাটা যখন কোন একটি প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করা হয় তখন সেই প্রতিষ্ঠানটির জনবল ও তাদের দক্ষতা শতগুন না হলেও বহুগুন বাড়াতে হয়। বাড়াতে হয় সেই জনবলের মধ্যকার সমন্বয়। এইচপিএসপির ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল কেনা-কাটার মত অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে ব্যর্থতা। দেখা গেছে একটি কম্পিউটার কিনতে লেগে গেছে চার-পাঁচ বছর। ততোদিনে অর্ডার দেয়া কম্পিউটারটির মডেল এতা পুরানো হয়ে গেছে যে, না তা বাজারে পাওয়া গেছে আর না দিয়ে আর কোন কাজ করা যেতো। জীবন রক্ষাকারী ঔষধ কিংবা জন্মনিরোধক সামগ্রীর মত অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে।

সেক্টর কর্মসূচি চালুর ক্ষেত্রে যে ধরণের প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন তা না করে কর্মসূচিটি চাপিয়ে দিলে হিতে বিপরীত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এ ধরণের আমূল ও ব্যাপক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে পরিকল্পনা করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া উচিৎ।

২. সাধারণতঃ বিদেশী পরামর্শকদের সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যাপক সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস কার্যক্রম চালানো হয়। এখানেই নিহিত থাকে সবথেকে বড় ঝুঁকিটি। সরকারী কর্মকান্ডের এক একটি ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে ঠেকে শেখার মাধ্যমে চালু হয়। সরকারী একটি নিয়ম কছুিদিন চলার পর যখন তার একটি দুর্বলতা চোখে পড়ে তখন তাতে কিছু সংস্কার করা হয়। শতবর্ষ আগে প্রবর্তিত এসকল ব্যবস্থা বারংবার সংস্কারের ফলে বর্তমানে একটি মোটামুটি কার্যকর অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে।

বিদেশ থেকে যারা পরামর্শক হিসাবে কাজ করতে আসেন তাদের অনেকেরই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকে না। তবে তার থেকে বেশী বিপদজনক হচ্ছে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সরকারের বিভিন্ন সিস্টেম ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের ধারণার অভাব। যত শিক্ষাগত যোগ্যতাই কারো থাক না কেন, কিংবা তার ক্ষেত্রে যত গুণীই তিনি হোন না কেন, মাত্র কয়েক সপ্তাহে বা কয়েক মাসে একটি দেশের সরকারী ব্যবস্থার খুটিনাটি সবকিছু জেনে এবং স্থানীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি পুরোপুরি উপলব্ধি করে সে দেশের কোন কিছু সংস্কারের সুপারিশ করা সত্যিই অসম্ভব। পরামর্শকগণ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাতেও সঠিক তথ্য সকল সময়ে পাওয়া যায় না। যেমন আমাদের সরকারী কর্মীদের ইংরাজীতে দুর্বলতা এবং বিদেশীর সাথে কথা বলার সময়ে যা ঘটে থাকে তা না বলে যা ঘটা উচিৎ তা বলার প্রবণতার কারণে বিদেশী পরামর্শকগণ যখন কোন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে কথা বলেন তখন সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হতে পারেন।

বিদেশী পরামর্শকগণের কেউ কেউ যে বাংলাদেশ সম্পর্কে কত ভুল ধারণা নিয়ে কাজ করেন তা একটি ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে। এইচপিএসপির অধীনে একটি কর্মশালায় একজন ভারতীয় পরামর্শক, যত দূর মনে পড়ে একজন পরিবার পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতাগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন যে এখানে জন্মনিরোধক বড়ি খাওয়া নারীদের জন্য খুবই বিপদজনক, কেননা, এর ফলে স্বামীরা তাদেরকে সন্দেহ করে এবং সন্দেহের

বশবর্তী হতে স্বামীরা স্ত্রীদেরকে হত্যাও করে থাকে। তার বক্তব্যের মধ্যেই একজন কর্মকর্তা উঠে দাড়িয়ে বলেছিলেন যে কথাটা সত্য নয়। বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত এ ধরণের একটি ঘটনাও ঘটেনি। তিনি আরও বলেছিলেন যে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা যেভাবে নেতিবাচক রিপোর্টে অভ্যস্ত, তাতে এ ধরণের কোন ঘটনা ঘটলে তাতে হাজারো রং চড়িয়ে তাকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ জাতিসঙ্ঘের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। যখন তিনি উক্ত পরামর্শকের বক্তব্যের তথ্যের উৎস জানতে চাইলেন তখন পরামর্শক বললেন যে ভারত ও পাকিস্তানে এ ধরণের ঘটনা ঘটে। এভাবে তারা বাংলাদেশের প্রতি ভুল ধারণার ভিত্তিতে ভুল পরামর্শ দেন এবং ঋণদাতা সংস্থাগুলো সে সকল পরামর্শকে অর্থায়নের পূর্ব শর্ত হিসাবে আরোপ করে। এ ক্ষেত্রে ঋণদাতা সংস্থাগুলোর মধ্যে এক ধরণের গোয়াতুর্মী কাজ করে থাকে।

এ ধরণের ভুল পরামর্শ চাপিয়ে দেয়ার কারণে এইচপিএসপির জন্য সরকারকে বেশ কয়েকটি আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সরকার স্বাস্থ্য ক্যাডার ও পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডারকে একীভূত করে এবং স্বাস্থ্য ক্যাডারের অধীনে পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডারকে ন্যস্ত করে। এর ফল হয় অতীব মারাত্মক। মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ে। এর সাথে যোগ হয় পরিবার পরিকল্পনা সেবা সংক্রান্ত আরেকটি আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত। আগে পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী দিয়ে আসতেন। এইচপিএসপির অধীনে নিয়ম করা হলো যে কয়েক কিলোমিটার দূরের কমিউনিটি ক্লিনিকে গিয়ে নারীরা প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী নিয়ে আসবেন। ভিনদেশী পরামর্শকগণকে বোঝানো যায়নি যে আমাদের দেশের নারীদের জন্য বিষয়টি কত বিব্রতকর।

৩. সেক্টর কর্মসূচিতে ঋণদাতাদের সকলের ঋণ একটি যৌথ তহবিলে জমা রাখা এবং তার থেকে একই পদ্ধতিতে অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের বিধান থাকার কারণে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় উন্নতি হয় বটে, কিন্তু এর ফলে ঋণদাতাদের পক্ষে একত্রিত হয়ে সরকারের উপর অধিকতর চাপ সৃষ্টির সুযোগ তৈরী হয়। এইচপিএসপির শেষ পর্যায়ে পুরো কর্মসূচির মাত্র চার শতাংশ উন্নয়ন সহযোগীরা অর্থায়ন করতো। কিন্তু তার জন্য বহু আত্মঘাতি সুপারিশ সরকারকে মানতে হয়েছে। সেক্টর কর্মসূচির আওতায় সকল ঋণদাতারা একজোট হয়ে ঋণ দেয়ায় তাদের তুলনায় সরকারের অবস্থান থাকে বেশ দুর্বল। ক্ষতিকর শর্ত না মেনে কোন এক বা একাধিক ঋণদাতার সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে আসার কোন পথ থাকে না।

জনগণের করের টাকায় পরিচালিত সরকারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে সেক্টর কর্মসূচির আওতায় আনা গেলে অপচয় কমিয়ে সম্পদের অধিকতর পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রে যে ব্যপক সংস্কার প্রয়োজন তার ঝুঁকিসমূহকে সঠিকভাবে বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করার পরিণতির বিষয়টিও মাথায় রাখা প্রয়োজন।